

ছেটি গল্প

শবযাত্রা

হুমায়ূন আহমেদ

শব্দযাত্রা

আমি অগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে মানুষটাকে দেখছি। গ্রামের আর দশটা মানুষের থেকে তাকে আলাদা করার কিছু নেই। তার প্রতি কৌতূহলী হবারও কোনো কারণ নেই।

কাঁচা-পাকা চুল, রোসে ঝুলে যাওয়া খসখসে চামড়া, চোখে ভরসাহারা দৃষ্টি। মানুষটা আমার সামনে বেকিতে বসে আছে। বসে থাকার ভঙ্গিটাও রান্ধির। মনে হচ্ছে এতুনি ঘুমিয়ে পড়বে। আমাদেরকে খিরে বেশ কিছু লোকজন। তাদের চোখেও কৌতূহল। তারা মজার কোনোকিছুব জানো এতীক্ষা করছে। অনেকের মুখেই চাপা হাসি।

আমি লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আপনার নাম কী?

লোকটা সহজভাবে উত্তর দিল, আমার নাম রহমান মিয়া।

আমাদের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে তারা এই উত্তরেই মনে হয় মজা পেয়ে গেছে। এ ওর দিকে তাকায়। সবার মুখই হাসি হাসি। রহমান মিয়া নাম শুনে হাসি পাওয়ার কী আছে বুঝতে পারছি না। লোকটাকে দ্বিতীয় কী প্রশ্ন করব তাও বুঝতে পারছি না। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে চারপাশের কৌতূহলী দর্শক চাচ্ছে আমি লোকটির সঙ্গে কথা বলি। মজাটা যেন খেমে না থাকে। চলতে থাকে।

'আপনার শরীর ভালো?'

'জি ভালো।'

'আপনার হেলেমেয়ে কী?'

'সর্বমোট চার জন।'

উপস্থিত দর্শকদের একজন বলল, স্যার, হেলেমেয়েদের নাম জিজ্ঞেস করেন।

যে ভঙ্গিতে সে কথাটা বলল তাতে বোঝা যাচ্ছে নাম জিজ্ঞেস করার পরই আসল মজা শুরু হবে। কাজেই আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার হেলেমেয়েদের নাম কী?

রহমান মিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, নাম ইয়াদ নাই।

দর্শকরা অনেকেই অনাসে হেসে ফেলল। একটা মানুষ তার হেলেমেয়েদের নাম মনে করতে পারছে না এর মধ্যে হাস্যরসের কিছু নেই। ঘটনাটা বেননানায়ক। অথচ সবাই হাসছে। সবাই আনন্দ পাচ্ছে।

'স্যার, আপনি জিজ্ঞেস করেন তার বাবার নাম কী?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রহমান মিয়া, আপনার বাবার নাম কী?

রহমান মিয়া শান্ত গলায় বললেন, আমার বাবার নাম ইয়াদ নাই। বিশ্বরণ হয়েছি।

দর্শকদের হাসি প্রবল হল। আমার মনটাই খারাপ হল। খুঁটিশক্তি নষ্ট হওয়া কষ্টের ব্যাপার। হাসির ব্যাপার না। এটা নিয়ে মজা করার কিছু নেই। অথচ গ্রামের মানুষরা হৃদয়বীরের মতো কাজটা করছে। এখানে এসে পৌঁছার পর থেকে শুনি, 'রহমান মিয়া'র খবর দিয়া আনতেছি। বড় মজা পাবেন'।

সেই রহমান মিয়াকে আনা হয়েছে। সবুজ রঙের লুঙ্গি এবং সাদা রঙের একটা চানর গায়ে সে রাস্তা ভঙ্গিতে আমার সামনে বসে আছে। বেচারার তার হেলেমেয়েদের নাম মনে করতে পারছে না, বাবার নাম মনে করতে পারছে না। গ্রামের মানুষেরা এতেই মজা পাচ্ছে। অথচ আমি পাচ্ছি না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে লোকটির আলজেরিয়ার'স ভিজিট হয়েছে। যে রোগ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের হাতে পারে সেই রোগ নেত্রকোনা জেলার কলঘাট গ্রামের রহমান মিয়া'রও হতে পারে—রোগ মানুষ বিচার করে না।

দর্শকদের মধ্যে অতি উৎসাহী একজন বলল, স্যার, আপনি জিজ্ঞেস করেন কেন সে হেলেমেয়েদের নাম বিশ্বরণ হয়েছে, বাবার নাম বিশ্বরণ হয়েছে।

আমার আর কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। ঘরে ঢুকে শীতলপাটিতে শরীর এলিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আশপাশের মানুষদের এভাবে রেখে যেতেও খারাপ লাগছে। কলঘাট থেকে এরাই রিকশা ভাড়া করে রহমান মিয়াকে এনেছে। এদের অগ্রহ এবং উৎসাহে পানি ঢেলে দিতে খারাপ লাগছে। কাজেই আমি বললাম, রহমান মিয়া, হেলেমেয়েদের নাম আপনি ভুলে গেছেন কেন? বাবার নামই বা ভুলে গেছেন কেন? কিছু কিছু নাম আছে কেউ কখনো ভুলে না।

রহমান মিয়া বললেন, মৃত্যুর পর সব ভুলে যায়। অমরিন আগে মৃত্যু হয়েছে বলে আমার নিজের নামটা মনে আছে। আর সব বিশ্বরণ হয়েছি।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, আপনার মৃত্যু হয়েছে মানে কী?

'গত বৈশাখ মাসে রাত্রি জিহহরে আমার মৃত্যু হয়েছে।'

'বৈশাখ মাসে আপনি মারা গেছেন। আর এটা হচ্ছে আশাঢ় মাস। অর্থাৎ তিন মাস হল আপনি মারা গেছেন।'

'দুই মাস উনিশ দিন।'
 দর্শকদের হাসি এবল হল এবং আমিও বুঝলাম কল্যাণী থেকে পঞ্চাশ টাকা বিকশ ভাড়া কবুল করে এই লোকটিকে আমার কাছে আনার কারণ আছে। তবে কারণটা যথেষ্ট না। লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা-খারাপ একজন মানুষ অনেক কিছুই বলতে পারে। তাকে নিয়ে মজা করা যায় না।
 'আপনি নিশ্চিত যে বৈশাখ মাসে আপনি মারা গেলেন?'
 'জি।'
 'আপনার কবর হয়েছিল, না হয় নি?'
 'কবর খোদা হয়েছিল, কিন্তু আমার কবরে নামায় নাই।'
 'কেন?'
 'আমি তখন উঠে বসেছি। জিন্মা মানুষের মতো কথা বলেছি। পানি খেতে চেয়েছি। সবাই তাবছে আমি জিন্মা।'
 'অসলে আপনি জিন্মা না?'
 'জি না।'
 'আপনি মারা গেলেন, কিন্তু আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই আছে?'
 'আছে। আগের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু আছে। কেন যে আছে এইটাও বুঝি না।'
 করোপকলন এই পর্যায়ে বন্ধ করতে হল। কারণ আমার নশতা খাবার ডাক এসেছে। যে বাড়িতে আমি উঠেছি সে বাড়ির কর্তা (হেডমাষ্টার, সোহাগী হাইস্কুল) আমাকে ডাকতে এসেছেন। হেডমাষ্টারদের চোখে ত্বকবিদ্যাত যে বিতৃষ্ণা থাকে, সেই বিতৃষ্ণা নিয়ে তিনি রহমানের নিকে তাকালেন। অশপাশের লোকদের নিকে তাকালেন এবং সমস্ত বিতৃষ্ণা চোখের নিম্নে এক পাশে সরিয়ে রেখে আমার নিকে তাকিয়ে মধুর গলায় বললেন, স্যার, একটু বিষয় আছে। ভিতরে আসেন।
 বেশ কিছু নতুন নতুন জিনিস আমি গ্রামে এসে লক্ষ্য করছি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাওয়াশাওয়ার ব্যাপারে লোকসমাজে উত্থাপন করা হয় না। "স্যার, নশতা খেতে আসুন" বলায় কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু আমাকে বলা হচ্ছে—একটা বিষয় আছে। খাওয়াশাওয়ারকে "বিষয়" বলা কি গ্রামে সর্বজনীন না এই বাড়িটির বিশেষত্ব তা এখনো বুঝতে পারছি না।
 আমি হেডমাষ্টার সাহেবের আশ্রয়ে গত তিন দিন ধরে আছি। তিনি যথেষ্ট অসহন করছেন। তবে কী কারণে যেন তাঁর ধারণা হয়েছে আমি 'বোকা টাইপ' মানুষ। জগতের জটিলতা থেকে আমাকে দূরে রাখা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। হেডমাষ্টার সাহেব এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন। পারলে একটা কচের বৈয়েমে ভরে আমাকে শিকায় বুলিয়ে রাখতেন। সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে একটু মনঃকল্প।

হেডমাষ্টার সাহেবের হাতে আমি কী করে পড়লাম, সেই গল্প এখানে অব্যবহ।
 তবু বলে নিচ্ছি, তা হলে আমার অবস্থানটা পরিষ্কার হয়।
 একটি দৈনিক পত্রিকায় আমি প্রতি সপ্তাহে কলাম লেখি। কলামের নাম 'নিজেরে হারিয়ে খুঁজি'। হালকা বিষয়কল্প নিয়ে হালকা কলাম। যেমন ঢাকা নগরীর ভিত্তিক। নগরীর সৌন্দর্যের এরাও যে একটা অংশ এইসব হাবিজাবি। একটা কলাম লিখলাম ঢাকা শহরের অবহেলার পাশে 'তাক' নিয়ে। যখন যা মনে আসে তা নিয়ে লেখা। যেহেতু কলামগুলি বাজনৈতিক নয় কাজেই কেউ সেসব গুরুত্বের সঙ্গে পড়ে বলে আমার কখনো মনে হয় নি। আমার সব সময় মনে হত আমি এবং পত্রিকার কম্পোজিটর আমরা দুজনই 'নিজেরে হারিয়ে খুঁজি' কলামের লিখি পাঠক।
 এই ধারণা ভুল অমাপিত হল যখন আমার জুলাইর এক বন্ধু টেলিফোন করে বলল, 'তোমার একটা কলাম পড়ে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেছে।' আমি খুবই চিন্তিত বোধ করলাম। রোমহর্ষক কোনো কলাম লিখেছি বলে মনে পড়ল না। আমি বললাম, কোন লেখাটার কথা বলছ?
 সে অতিরিক্ত রকম আত্মহের সঙ্গে বলল, ওই যে জোছনা নিয়ে লেখা। দোস্ত, তোমার লেখাটা আমি অফিসের সবাইকে পড়ে শুনিয়েছি।
 'ও আচ্ছা।'
 'ও আচ্ছা না। মারাত্মক লিখেছিল। জুলে রূপিত রিডারে পাঠ্য হবার মতো লেখা। অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে।'
 বন্ধুর উৎসাহে নিজেকে বৃত্ত করতে পারলাম না—কারণ লেখাটা এমন কিছু না। আমার অন্যসব লেখার মতোই হালকা, গভীরতাইন। লেখাতে আমি ঢাকার মেঘরকে অনুরোধ করেছিলাম, নগরবাসীকে পূর্ণিমা দেখার তিনি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেন। ভরা পূর্ণিমার সময় ঢাকা নগরে তিনি যেন দু ঘণ্টার জন্যে হলেও ইলেকট্রিসিটি অফ রাখেন। সেখান থেকে চলে গেছি গ্রামের বাঁশবাড়ের পূর্ণিমা। যে পূর্ণিমার নাম কাজলা দিদির পূর্ণিমা। লেখাটি শেষ করেছি পূহত্যাগী পূর্ণিমা। যে পূর্ণিমা রাজকুমার সিদ্ধার্থ ব্রী-পুত্র হেড়ে পূহত্যাগ করেছিলেন।
 আমার বন্ধু বলল, দোস্ত তুমি আমাকে পারমিশন দে, আমি তোকে কাজলা দিদির বাঁশবাড়ানে জোছনা দেখিয়ে আনব। তখন তুমি এ রকম আরেকটা লেখা লিখতে পারবি। একটা ফাঁটাফটি হয়ে যাবে।
 আমি বললাম, আচ্ছা।
 'তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক লিখে রাখ নেজট পূর্ণিমা কাজলা দিদির বাঁশবাড়ানে জোছনা। কথা সিদ্ধিস?'
 'পূর্ণিমার তো সেটি আছে। এখনই কথা দিতে হবে?'
 'হ্যাঁ, এখনই কথা দিতে হবে। আমি সরকারি চাকরি করি। তোমার মতো কাড়া

হাত-পা না যে যখন তখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারি। আমাকে আগেই ছুটিও দরখাস্ত করতে হবে। বল, ইয়েস।'

আমি ইয়েস বলে ফেঁসে গেলাম। আমাকে একা নেহেতানা জেলার এই অতি অভয় পাড়াগাঁয়ে এসে উপস্থিত হতে হয়েছে। কারণ বহুটি শেষ মুহুর্তে ছুটি পায় নি। যেহেতু আগেই সব ধরনের সেবা, আমাকে একাই আসতে হয়েছে। আমি না এসে বন্ধুর ইচ্ছাত থাকে না। সে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

পূর্ণিমা দেখার যে বিপুল আয়োজন হয়েছে তা খুবই হাস্যকর, কিন্তু আমি হাসতেও পারছি না। হেডমাষ্টার সাহেবের বাড়ির কাছে বিশাল এক বাঁশবন শলার ঝাড়ু নিয়ে কেড়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। জঙ্গলে যা হয়—বাঁশগাছের সঙ্গে অন্য কিছু গাছও থাকে। সেইসব গাছ ফুড়াল দিয়ে কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। কারণ হেডমাষ্টার সাহেবকে জানানো হয়েছে আমি বাঁশবনের জোছনা দেখতে চাই। বনের মাঝখানে চেয়ার-টেবিল পাতা হয়েছে। আমি চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রেখে জোছনা দেখব।

সমস্যা হচ্ছে গত তিন দিন ধরে আকাশ মেঘলা। চাঁদের দেখা নেই। গত রাতে পূর্ণিমা ছিল—চাঁদের দেখা পাওয়া যায় নি। বৃষ্টি পাওয়া গেছে। সারা রাতই বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃষ্টি না হলেও আকাশ মেঘে মেঘে কাগো। আমি এক শ ভাল নিশ্চিত সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। আমি তাতে মোটেই দুরবিত বোধ করছি না। আগামীকাল সকালে ঢাকায় চলে যেতে পারছি এতেই আমি আনন্দিত। পুরোপুরি নগরবাসী মানুষের জন্যে গ্রামের সব অভিজ্ঞতা সূচকরও না। গ্রামে বাস করতে এসে বাচ্চা খেতেই হবে।

ঢাকা শহরে আমি নিশ্চয়ই এমন কাউকে পাব না যার ধারণা গত দু মাস উনিশ দিন ধরে সে মৃত। যদি কেউ পেকেও থাকে—তার আত্মীয়জন তার চিকিৎসা করবে। যত্ন করে ঘরে রেখে পুঁথবে না। দর্শনীয় কিছু হিসেবে তাকে ভাড়া করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেবেও না।

হেডমাষ্টার সাহেবের সব আয়োজনেই ব্যাড়াবাড়ি থাকে। বৈকালিক নশতার আয়োজনও অন্তর। নশতা হিসেবে গোলাও করা হয়েছে। গোলাও এবং গরুর ভুনা মাংস।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এটা বিকাশের নশতা?

হেডমাষ্টার সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, কফি অনিয়েছি। খানার পর কফি আর নোনতা বিকুট। আমি যথেষ্ট পরিমাণ আশ্বস্ত হয়ে গোলাও খেতে বললাম। কারণ 'না' বলে লাভ হবে না। খাওয়াশাওয়ার ব্যাপারে 'না' শব্দটির সঙ্গে এরা পরিচিত নয়। অতি সুখস্যাও যে মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছা করে না এই ধারণা সম্ভবত গ্রামের মানুষের নেই।

যিয়ে জবজব গোলাও মুখে দিতে দিতে বললাম, রহমান মিয়া লোকটা সম্পর্কে হেডমাষ্টার সাহেব আপনি কী জানেন?

হেডমাষ্টার মুখভরতি গোলাও নিয়ে বললেন, হারামজাদাকে জুতাপেটা করা উচিত। ইডিয়ট।

আমি বললাম, কেন বলুন তো?

'ফাজলামি করছে না। সে জিন্দা না মূর্দা এটা সে বলার কৌ এটা হল নশজনের বিবেচনা।'

'আপনাদের বিবেচনায় সে জিন্দা?'

'অবশ্যই। এমবিবিএস ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে যে বেঁচে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে পাস করা ডাক্তার এসেছিল?

'জি এসেছিল। পাসল দেখেছে। ব্লাড হেসার মেপেছে। পাসল একটু ডাউন আছে তবে হেসার নরমাল।'

'একটা লোক কথা বলছে, ইটাই, খাচ্ছে। সে যে বেঁচে আছে তার জন্যে এটাই যথেষ্ট না? পাসল দেখতে হবে, ব্লাড হেসার মাপতে হবে?'

হেডমাষ্টার সাহেব জামবাতিভরতি গরুর মাংসের প্রায় সবটা নিষ্পন্ন করে ফেললেন, গ্রামে হল আপনাব অশিক্ষিত মূর্খ জনগোষ্ঠীর বাস। এসের জন্যে পাসল দেখা লাগে, ব্লাড হেসার মাপা লাগে।

'এরা কি বিশ্বাস করে কেলেছিল যে রহমান মিয়া মৃত?'

'আপনাকে বলব কী? বোল আনা মানুষের মধ্যে নশ আনা বিশ্বাস করে রহমান মিয়া মারা গেছে। এখনো বিশ্বাস করে।'

'বলেন কী?'

হেডমাষ্টার সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, শিকার আলো এই জন্যেই দিকে দিকে ভুলানো দরকার। নবীএ করিমের (সঃ) সই হাদিস আছে, শিকার জন্যে সুদূর চীনে যাও। আছে না?

'জি আছে।'

হেডমাষ্টার সাহেব চতুর্ধবারের মতো তাঁর প্রেটে গোলাও নিলেন। জিন্দা লাশকে দেখে আমি যেমন অবাক হয়েছিলাম—প্রায় সূতার মতো শরীরের হেডমাষ্টার সাহেবের খাওয়া দেখেও প্রায় তেমন অবাকই হচ্ছি। আমি খাওয়া শেষ করে হাত ওঠিয়ে ফেলেছি দেখে হেডমাষ্টার সাহেব বাড়ির বাড়ি গোশত প্রেটে ঢালতে ঢালতে বললেন, কফি বানাচ্ছে। কফি খান। তারপর কীচা সুপারি দিয়ে একটা পান খেয়ে তয়ে ঘুম সেন। আকাশের যে অবস্থা আজ বোধহয় চাঁদ উঠবে না। তবে আপনাদের কথা দিলাম, চাঁদ যত রাতেই উঠুক বাঁশবনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে যাব, কফি নিয়ে যাব ব্লাস্কে করে। আরাম করে জোছনা দেখবেন। জোছনা দেখার সময় যেন মশা ভিসটার্ব না করে এই জন্যে গ্রাভ মার্কা মশার কলে অনিয়ে রেখেছি। সব রেডি করা আছে।

আমি বললাম, আপনি বলতে শুরু করুন। আমার পুত্রের ঘৃণিত অঙ্গেল সেই।
আমি বলা যেমন আমার সঙ্গে গরু ভবি।

‘বললেন, এই জায়গা কখনো না।’

‘অনুগ্রহ করুন। পুত্রের ব্যাপারে আমার কাছে খুবই ইতিবাচক মনে হচ্ছে।’

‘যত ইতিবাচকই মনে হোক, কথা বলতে না। আমার বিজ্ঞপত্রটি। কথা বলতে
সমস্যা আছে।’

‘কী সমস্যা?’

কী সমস্যা হেডমাস্টার সাহেব ব্যাখ্যা করলেন না। নিঃশব্দই নির্ভর একজন
মানুষের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে হেডমাস্টার সাহেবের এর অন্যতমের কারণ খোঁজতে
পারলাম না। আমি এক কাগজে সেতু গেয়ে তিনি নিজে কখনো কখনো গেয়েলা হতে
হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে গরু করতে পারেন।

আমরাই বর্ণকরা এলো আছে। তারা আমায় বর্ণিতের ছিল, এমন বর্ণিতের ছিল
বলেছে। মনে হচ্ছে তারা আমায় কিছু ‘মজা’র প্রত্যাশী। আমি হেডমাস্টার সাহেবের
নির্দেশিকা কথা বলতে চাইলাম তা বেশেয়ে সফল হয়ে না। আমি এখানে বসতে
বসতে কী কখন না-কখন কখনো লেগে এটা বললাম। আমার মনে হচ্ছে হেডমাস্টার
সাহেব মনে কেমনে কোনো বিচিত্র কারণে একটি কুল শাকল তুলে গেছে। কুল
শাকলটি ঘুর করতল কেটে এটা করতে না। সবাই মজা পাচ্ছে। কুল শাকল ঘুর করে
আমরাই হো ‘মজা’র সমস্যা।

‘হেডমাস্টার সাহেব।’

‘জি।’

‘আপনি যে মজা গেয়েন এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?’

‘জি।’

‘কখনো সন্দেহ হয় না?’

‘না।’

‘এক নিশ্চিত হলেন কীভাবে?’

হেডমাস্টার সাহেব উঠল না দিয়ে কী হাত তুলে করে আমাকে দেখল। আমি
দেখলাম, হাতের তালুর নিচে চামড়া কাটা হয়ে স্ট্রুকে আছে। কেঁতকালে কালে চামড়া
মুগুরে জমাট হয়ে পড়ে না। আমি কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে অছি—সর্বকালে একজন
কল, ‘কুশির উপর হাত রাখিল। চামড়া খুঁজা গেছে। কোনো তুলু পাও নাই।’

চামড়া পুড়তে কিছু বলা পাচ্ছে না, নিশ্চয়ই এর কোনো ব্যাখ্যা আছে। যে মানুষ
চলবে বেশ মজিত দিয়ে তার সেই মানুষ নই হয়ে গেছে বা এই জায়গায় কিছু হয়েছে।
হাতের কাটা কাটা পড়লেন। কুঁচকলেন এ কখন হয় বলে কখনো। কুঁচকলীর
তুলে অনুভূতি নই হয়ে যায়।

আমি বর্ণকদের সিকে তাকিয়ে বললাম, আপনিদের কি শাকল হেডমাস্টার সাহেব
কুল একজন বর্ণকদের মতো কল, আড়াতে কলমে আর অল্পের মতিন ঘটে।

সবই আড়াহুড়কের কুলকরা।

‘অর্থাৎ আপনি বিভ্রান্ত করছেন সে মূর্তা?’

‘আমি বিশ্বাস করি না, আমার মনে অবিশ্বাস করি না।’

‘সেটা কেন বলল?’

‘সম্পদ বিভ্রান্ত হতে পারে পাই কিন্তু, হাতে হাতে পাই মূর্তা। মূর্তায়ে কোনো
সময় মশায় কামড়ায় না। হেডমাস্টার সাহেবের মশায় হয়ে না।’

‘মোরে মশা এক খাবার জাতের পোলের পুঁকির জাত। হেডমাস্টার সাহেবের হাতে
হাতের কোনো সমস্যা আছে যে মশা মশার জাত এক পাচ্ছে না।’

‘জি হঠাৎ করে পার?’

‘আমার ব্যাখ্যা হেডমাস্টার সাহেব কালো ডিকিয়ার ইজা নককরা। তার পোলের
মশা। এই রোগ সারাতে হবে।’

‘পরিব্রাজক। তার জোটে না আমার ডিকিয়ার?’

আমি হেডমাস্টার সাহেব সিকে তাকালুম। কখনো কেমনে মনে ছিল এখানে টিক
সেইভাবেই বসে আছে।

হঠাৎ মনে হল হেডমাস্টার সাহেব মতো খুবই অস্বাভাবিক কিছু আছে। যা বললে
আমার রোগ এড়িয়ে যাচ্ছে। অস্বাভাবিকতাটি কি বলে থাকার কখনো কেউকে নাকি
তাকানোর কেউকে সে করে সিকে প্রাণ তুলে রাখাচ্ছে না। সে তাকিয়ে আছে মতিন
সিকে।

‘হেডমাস্টার সাহেব।’

‘জি।’

‘তাকান হো আমার সিকে?’

হেডমাস্টার সাহেব তাকাল। আমি বললাম, আমার সিকে তাকিয়ে বসুন। না বলা পর্যন্ত
রোগ নাহলে না।

‘জি আসা।’

হেডমাস্টার সাহেব তাকালেন। কিছুক্ষণের মাঝেই অস্বাভাবিকতাটি আমার কাছে
পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি এখানে পাতা লেগেন না। একবারও না। নিশ্চয়ই এরও
কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। কিছু আমার কুল বক করে শাকল মতো লাগল।
কালোটা কী? আমার মনে হচ্ছে আমি এই মানুষটিকে কেমনে কেমনে সিকে আমাকে মূল
সেবারে পাই। যা দেখছি তার সঙ্গে আমার প্রাণ-কাল পুঁকির কোনো মিল নেই।
আমি নিশ্চিত যে কখনোই মশাই এ কখন মনে হচ্ছে।

‘হেডমাস্টার সাহেব।’

‘জি।’

‘আপনি মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকান না কেন? সব সময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন।’

রহমান মিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাই।

তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কেন তিনি মানুষের চোখের দিকে তাকান না তা তিনি জানেন, কিন্তু বলতে চাচ্ছেন না।

রাত্রে আমার ঘুম হল না। রহমান মিয়ার ব্যাপারটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চেষ্টা করেও পারছি না। নানান উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসছে। জীবিতদের মাঝখানে মৃত মানুষরা ঘুরছে এ ধরনের গল্পগাথা পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত। জমিদের নিয়ে রীতিমতো গবেষণামূলক গল্প আছে। কবর সেওয়ার পর মৃত মানুষ জীবিত হয়ে ফিরে আসে। পরিচিতজনদের সঙ্গে বাস করতে আসে। এরা না মৃত না জীবিত। এরা ‘জমি’। ডাকুলাসের গল্প তো সবারই জানা। জমিদের মতো ডাকুলাসও না মৃত না জীবিত। আমাদের রহমান মিয়া এ রকম কেউ না তো?

আচ্ছা এমন কি হতে পারে রহমান মিয়ার শরীর থেকে আত্মা চলে গেছে? তা হলে আত্মা ব্যাপারটা কী?

শেখরাতের দিকে ঘুমাতে গেলাম এবং খুব সম্ভবত কাবাগেই ভয়াবহ দুঃখপূর্ণ সেখলাম—সেখলাম শব্দত্রয়ের দৃশ্য। কবরখানার দিকে যাচ্ছি। আমাদের আগে আসে খাটিয়া যাচ্ছে। তবে খাটিয়াতে কোনো শব্দসহ নেই। শূন্য খাটিয়া। শব্দসহ আমাদের সঙ্গেই হেঁটে হেঁটে কবরখানার দিকে যাচ্ছে।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। হেডমাষ্টার সাহেব ডেকে তুললেন। নান্দাইল রোড স্টেশন থেকে বারটার সময় ট্রেন যাবে ঢাকার দিকে। এখন উঠে রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারব না। নাশতা রেডি আছে। রিকশাও রেডি। নাশতা খেয়েই রিকশায় উঠতে হবে। হাতে একেবারেই সময় নেই।

অতি দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে নাশতা নিয়ে বসলাম। হেডমাষ্টার সাহেব গলা নিচু করে বললেন, ওই হারামজাদা সকাল থেকে এসে বসে আছে। তার সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড। হারামজাদা বাড়ি চিনে ফেলেছে। এখন রোজ আসবে।

আমি বিব্রিত হয়ে বললাম, কার কথা বলছেন?

‘রহমান মিয়া।’

‘কী চায়?’

‘আপনাকে কী নাকি বলবে? কিছু বলার দরকার নাই।’

রহমান মিয়ার ওপর হেডমাষ্টার সাহেবের তীব্র রাগের কাবল আগেও ধরতে পারি নি। এখনো ধরতে পাবলাম না।

নান্দাইল রোড স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছি। কাদাভরতি রাস্তা। অনেক কষ্টে রিকশা টেনে টেনে নেয়া হচ্ছে। রিকশা ধরে ধরে এগুচ্ছে রহমান মিয়া। আমি বললাম, কিছু বলবেন রহমান মিয়া!

‘জি।’

‘বলুন তিনি।’

‘কথাটা এখন ইয়াস আসতেছে না।’

‘মনে পড়ছে না?’

‘জে না।’

‘খুব জরুরি কথা?’

‘জি।’

‘আপনার নিজের বিষয়ে কিছু কথা?’

‘জি।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, মনে করার চেষ্টা করুন। আরেকটা কথা শুনুন—ঢাকায় গিয়েই আমি আপনার বিষয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব। সম্ভব হলে আপনাকে ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করব। ডাক্তারদের সঙ্গে আগে কথা না বলে আপনাকে নিতে চাচ্ছি না।’

‘জি আচ্ছা।’

‘আমাকে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলেন সেগুলো কি মনে পড়ছে?’

‘জে না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। মনে করার চেষ্টা করুন।’

নান্দাইল রোড স্টেশনে অপেক্ষা করছি। খবর এসেছে ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। হেডমাষ্টার সাহেব আমার সঙ্গে আছেন। ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে তারপর যাবেন। হেডমাষ্টার সাহেব রহমান মিয়াকে আমার ধারেকাছে বেঁধেতে মিচ্ছেন না। ছাতি হাতে তাকে মারতে পর্যন্ত গেলেন। আমি বললাম, হেডমাষ্টার সাহেব আপনি লোকটাকে সহ্যই করতে পারছেন না কেন, বলুন তো?

হেডমাষ্টার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, আরে একটা মরা মানুষের সাথে কী কথা?

‘মরা মানুষ মানে? কী বলছেন আপনি?’

হেডমাষ্টার সাহেব থু করে থুতু ফেলে বললেন, মরা না তো কী! ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, হারামজাদার মাথার উপরে শকুন উড়ছে। যেখানে যায় শকুন চলে আসে। সেখেন, নিজের চোখে দেখুন।

আমি দেখলাম রহমান মিয়া রেন্টি গাছের নিচে বেঞ্চিতে বসে আছেন। হাতে বাদামের ঠোঁড়া। বাদাম খাচ্ছেন। গাছের ডালে কয়েকটা শকুন। দুটা শকুন রেললাইনের কাছে। এরা রহমান মিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিশ্চয়ই এরও কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা জানি না বলে অস্বাভাবিক লাগছে। আমি বললাম, রহমান মিয়ার বাড়িতেও কি শকুন আসে?

হেডমাষ্টার সাহেব বললেন—শকুন আসে, শিয়াল আসে, কুকুর আসে। তার বাড়ির সবাই যত্নশীল অস্থির হয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। সে এখন থাকে নিজের মতো। কেউ তারে জায়া দেয় না।

‘তাই নাকি?’

‘শকুন দেশ থেকে উঠে গিয়েছিল। এই হারামজাদা কোথেকে নিয়ে এসেছে। গ্রাম ভরতি হয়ে গেছে শকুনে।’

‘বলেন কী?’

‘গতকালকে আপনি তার সাথে কথা বললেন। সন্ধ্যার সময় দেখি তিনটা শকুন ওড়াউড়ি করছে। শকুন আসা খুবই অলঙ্কণ। এই জন্যেই হারামজাদারে দূরে দূরে রাখি।’

ট্রেন এসে পড়েছে, আমি ট্রেনে উঠলাম। আমাকে ট্রেনে উঠতে দেখে রহমান মিয়া জায়া ছেড়ে উঠে এলেন। হেডমাষ্টার সাহেব আবারো ছাতা নিয়ে তাকে মারতে যেতে চাচ্ছেন বলে মনে হল। আমি হেডমাষ্টার সাহেবকে হাতে ধরে থামালাম।

রহমান মিয়া জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, কথাটা মনে পড়েছে? রহমান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, বলুন কথাটা কী তনি।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। জানালা ধরে ধরে রহমান মিয়া এগুচ্ছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কথাটা কেউ বুঝবে না, আপনি বুঝবেন।

‘বলে ফেলুন?’

‘এখন আবার ইয়াস হইতেছে না।’

রহমান মিয়া হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রেন তাকে ছেড়ে চলে আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, দুটা শকুন হেঁটে হেঁটে এগুচ্ছে তার দিকে। শকুনরা যে অবিকল মানুষের মতো হাঁটে এই তথ্য আমার জানা ছিল না। জগতের কত কিছুই তো মানুষ জানে না।

